জীবন সরকারের ছোটগল্পে প্রকৃতি-চিত্রন : এক অজনা, অসীম এবং অনিঃশেষিত রূপ

শিবনারায়ণ রাউত

গবেষক (পিএইচ.ডি), বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর,দার্জিলিং

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ বহুব্যঞ্জনাময়। শব্দটির অনেক অর্থ, অনেক তাৎপর্য। প্রাসঙ্গিক অর্থে প্রকৃতি বিশ্বভূমা পরিচয়বাহক শব্দ।বিশ্ববিধান, বিশ্বজগত এবং বিশ্বমানব সমস্তই এতে সন্নিবিষ্ট। আপেক্ষিক অর্থে, প্রকৃতি সাধারনত তার ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। আর, এটা অনেকাংশে নির্ভর করে উদ্দিষ্ট লেখকের জীবনবোধ সংযুক্ত জীবনানুগ অর্থে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠার পরিকল্পনায়। প্রকৃতি তার বিচিত্র স্বভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে শিল্প রসিক মানুষ মাত্রকেই অভিভূত করে। বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপের যে প্রাচুর্য তাকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন দেশের আবহাওয়াগত কারণে এক দেশের প্রকৃতি তার অন্তররূপের প্রকাশ ঘটায়। প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য প্রকৃতি পাগল মানুষের মনে ঘটায় ভাবের উন্মেষ। ফলে সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে প্রকৃতি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদ থেকেই প্রকৃতি চেতনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, পবন প্রমুখ দেবতাদের বন্দনা গানে প্রকৃতির বর্ণনা সুসমৃদ্ধ।বিভিন্ন প্রাচীন ঋষিরা নদ- নদীর যে বন্দনা গান করতেন তাতেও প্রকৃতি অসামান্য রূপ দক্ষতায় উঠে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে প্রকৃতির অসামান্য চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম", "মেঘদূতম", " ঋতুসংহারম" এ প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট রূপ অঙ্কিত। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও কবিরা প্রকৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করেছেন। বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন " কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতিও অসাধারন। বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রকৃতি মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিরা প্রকৃতিকে তাঁদের অনেক পদে অনুষঙ্গ করেছেন। মঙ্গল কাব্যগুলিতেও প্রকৃতি প্রেক্ষাপট হিসাবে বারবার এসেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের নৌকায় ঝড়ের তাণ্ডব, মনসার কোপে চাঁদ সওদাগরের সুপারি বাগান তছনছ হয়ে যাওয়া, শিবায়ণ কাব্যে শিবের চাষ আবাদ ইত্যাদির বর্ণনায় কবিরা প্রকৃতিকে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। আধুনিক যুগে কবিতার অঙ্গনে প্রকৃতির অসামান্য বর্ণনার স্বাদ আনলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর "সঙ্গীতশতক", "সারদামঙ্গল ", " সাধের আসন ", কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকৃতির বর্ণনায় অনুপম চিত্র। আজন্ম ঔপনিষধিক ভাবনায় ভাবিত রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি সত্য-শিব-মঙ্গলের বাণী হয়ে উঠেছে। বাংলা কথা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়,বিমল মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক অনেক সাহিত্যিকদের কলম বিধৃত হয়েছে প্রকৃতি চিত্রনের দক্ষতায়। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যিকদের কলমে প্রকৃতি এক বড় অনুষঙ্গ হয়ে ধরা পড়েছে।

ষাটের দশকে গল্প লিখতে আরম্ভ করা জীবন সরকার তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন --

" বাংলার মানুষ, নদ - নদী, নিসর্গই আমাকে গল্পকার করেছে। আমার গল্পে ভাষা জোগান দিয়েছে। "১

যে লেখক এই স্বীকারোক্তি দিতে পারেন, তাঁর লেখায় প্রকৃতির উপস্থিতি কীভাবে এবং কতভাবে এসেছে --- তা আমরা পরখ করবো।

জীবন সরকারের প্রকৃতি বিষয়ক অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রাম বাংলা। তিনি নিজে অনেক জায়গায় বলেছেন, গ্রাম বাংলার প্রকৃতি তাঁকে গল্পকার করেছে। আর, এই গ্রাম বাংলা মানে ছেড়ে আসা মাতৃভূমি ওপার বাংলা।দেশ হারিয়ে নতুন জীবন শুরু করা উত্তর বাংলা, এবং পরে কোলকাতার বিভিন্ন জায়গার প্রকৃতি তাঁর গল্পে রংবিস্তার করেছে।যেকোন লেখকের লেখাতেই প্রকৃতির বর্ণনায় বর্ষা এক অপরিহার্য উপাদান। গ্রাম বাংলার চাষীরা বর্ষার

দিকেই তাকিয়ে থাকে।বর্ষায় ধান জমিতে ধান আর পাটের আঁশ পেতে কাঁচা পাট জলে জাগ দেওয়া গ্রামীন মানুষের জীবনের অঙ্গ। অথচ বর্ষায় বৃষ্টি নেই--- এই কাহিনী নিয়ে লেখা উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে লিখিত গল্প " হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া" গল্পে দেরিতে বর্ষা আসায় প্রকৃতির কেমন হতশ্রী রূপ হলো গল্পকার তার চিত্র তুলে ধরেছেন -

" চারপাশে ধূ-ধূ মাঠ। খাঁ খাঁ করছে। আগাছা রৌদ্রে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বাতাসে আগুনের হলকা মাঠময়। গাছ- গাছালি রোদের তাপে ঝিমুচ্ছে। জমির মাটি ফাটা ফাটা, ভূমিকম্প হয়ে যেন ধরিত্রীর মাটি ভাঙচুর হয়ে গেছে। "২

এ গল্পের নায়ক মনা। আকাশে মেঘ দেখলেই তার বুকে জল আসে। বৃষ্টি নেই বলে লাঙল দিয়ে মাটি চাষাতে পারছে না। যদি চাষ না হয়, না খেয়ে মরতে হবে যে। জমিতে ধান বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার এটাই তো সময়। ভালো ধান হলেই তো কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। অথচ বৃষ্টি নেই।আসলে মানুষ তো প্রকৃতির কাছে পুতুল নাচ খেলার পুতুলের মতো। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় চাষীদের। তাই --

" আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মাঠের দিকে তাকানো যায় না। সব ঝলসে গেছে। রোদ যেন ঝিম মেরে বসে আছে। কাকপক্ষীও দেখা যায় না। ছিটেফোটা যে বৃষ্টি পড়বে তার নামগন্ধ নেই। "৩

মানুষ একটু দেরীতে বুঝলেও প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের প্রকৃতির পাঠ বোঝার ক্ষমতা অনেক বেশি। খুব মেঘ করলে যেমন মাঠের গরু-ছাগল - ভেঁড়া বুঝে যায় তাণ্ডব আসা অনিবার্য, তেমনি মাটির পিঁপড়েরাও বুঝতে পারে বৃষ্টি আসবে কিনা। গ্রামীন মানুষজনের বিশ্বাস পিঁপড়েরা দলবদ্ধভাবে সারিসারি করে গেলে কিছুদিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে।গল্পকার এই বিশ্বাসকে ভাষা দিয়েছেন অনবদ্যভাবে--

" মাটির দিকে তাকায় মনা,পিঁপড়ের সারি দেখা যায় কিনা। মাটির নীচের গর্ত থেকে পিঁপড়ে উঠলে বৃষ্টি হয়।বুড়োলোকেরা সেই কথা বলে। "৪

উত্তরবঙ্গে বসবাসের জন্য উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি যেমন জীবন সরকারের লেখায় প্রাণবন্তভাবে এসেছে, তেমনি এসেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির মুখের ভাষা, তাদের পূজা-পার্বণ, লোকগান ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলিতেও প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে দারুণভাবে। "হুদুমা দেখা দেওগো আসিয়া" গল্পে রাজবংশীদের লোকদেবতা হুদুম পূজায় রাতের প্রকৃতিকে লেখক তুলে ধরেছেন এইভাবে---

"আকাশ কালো হয়ে নেমে এলো ধরিত্রীতে। ওরা গোল হয়ে বসে পড়লো মাটিতে। বৃষ্টির জল ওদের উলঙ্গ শরীর ধুয়ে ধান খেতে নামলো। ওরা বুক ভরে বৃষ্টি নিলো ভিতরে। পূর্ণিমার আলো সরে গিয়ে আকাশ ভরা কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় মেয়েদের উলঙ্গ দেহ বৃষ্টির জলে এক হয়ে মিশে গেলো মাটির সঙ্গে। বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলসে গেলো মায়াময় জগৎ।" ৫

প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিয়ে লিখিত গল্প "ভিন গাঁয়ের রাজপুত্তুর "। শহর থেকে দাদার বন্ধু এসেছে। বৈকালীর মন ছেলেটিকে দেখে অজানা আনন্দে ভরে যায়। শরীরে আর মনে যেন অন্য রকমের ঝিলিক। মা ডাকছেন, সেদিকে তার খেয়াল নেই। যেন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের রাধা। অসাধারণ প্রকৃতি চিত্রের দক্ষতায় তা বর্ণিত----

" মা বোধহয় ডাকছেন। দূরে নদী ফুসছে। বর্ষার নদী উথাল-পাথাল। মহাজনী নৌকা নানারঙের বাদাম টাঙিয়ে ভেসে যাচ্ছে। উল্টোদিকে বাদাম না টাঙিয়ে আসছে ঘাসি নাও। জেলে ডিঙ্গি জলের উপর নাচছে। এই বুঝি জলের তলায় চলে যাবে। আবার ভাসছে। "৬

গ্রামজীবনের সুন্দর সারল্য, অনাবিল প্রকৃতি এবং সহজ মানুষগুলিকে দেখে শহরে আসা ছেলেটির বিস্ময়ের সীমা থাকে না।অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আল্পনা দিয়ে লেখক তা তুলে ধরেছেন---

" শিহরণ কোনোদিন গ্রামে আসেনি। এই প্রথম গ্রামে এসে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। গ্রামগুলি যেন জলের মধ্যে ভাসছে। সামনেই নদী। এক একটি বাড়ি নদীর বাঁধ। জলের কিনারে, ক্ষেতে সোনা রোদ্দুরের ঢেউ খেলে বেড়ায়। বাড়িতে কত রকম গাছ। কত রকম পাখি। "৭

সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ বৃষ্টি। এমন কোনো সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যার লেখায় বৃষ্টির প্রসঙ্গ আসেনি। এই বৃষ্টি যখন গ্রামের সুপারি, নারকেল, আম, জাম,কাঁঠাল গাছের মাথায় টুপটাপ করে ঝরে পড়ে, তার অপার্থিব সৌন্দর্য কত রঙিন হতে পারে গল্পকার দেখিয়েছেন এইভাবে --

" শিহরণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশ মেঘলা। আকাশ মেঘলা। পশ্চিমদিকে কালো মেঘ জমেছে। গাছে বাতাস নেই। ঝোড়ো হাওয়া ছাড়লো। গাছের ডালে পাগলা বাতাস। ওই বৃষ্টি পড়ল। একফোঁটা- দু ফোঁটা করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। শিহরণ নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। নদীর মধ্যে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। কী সুন্দর লাগছে। অনুদের বাড়ির সামনেই নদী। পিছনে শস্যের জমি। অন্যদিকে খাল। অপূর্ব। ঘরের বাবান্দা থেকেই এসব দেখা যায়। "৮

প্রেম- মনস্তত্ত্বকে প্রকৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা মহৎ লেখকের গুণ। সব লেখক এটা পারেন না। জীবন সরকার পেরেছেন। কারণ তাঁর কাছে প্রকৃতি নিষ্প্রাণ নয়, সপ্রাণ সত্তায় সদানন্দ। তাই তাঁর কলমে লিখিত হয়--

" নদীর মধ্যে শিহরণের চোখের সামনে আস্তে আস্তে কাঁচের আস্তরণ খসে পড়তে শুরু করেছে। একটু একটু করে বন্ধ দরজা খুলছে। বৈকালী তখন জলে নাইতে নেমেছে। শিহরণ গাছের নীচে। চোখ বৈকালীর দিকে। বৈকালীর চোখ যেন কাচ দিয়ে ঢাকা। "৯

পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন " ঘড়ি" হিসাবে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে প্রকৃতিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। জীবন সরকারও প্রকৃতিকে ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করে অনেক কথা ব্যক্ত করেছেন "দিন যায়" গল্পে --

" দিন যায়। সময় কারও জন্য বসে থাকে না। দেখতে দেখতে চারপাশের দৃশ্যপট আস্তে আস্তে পালটে যায়। বাগানের গাছ-গাছালির পাতা ঝরে যায়। আবার গজিয়ে উঠে। বৃষ্টি নামে, বর্ষা হয়। বর্ষায় মেঘের দাপাদাপিতে আকাশ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। ঝড় - তুফান কমে গেলে আকাশ নীল অপরাজিতা ফুলের সৌরভে গাছের পাতায় জল ঝরে। ঘুঘু পাখি ডাকে দেবদারু গাছে, গাছ গাছের আড়ালে কুটুম পাখি ডাকে হেমন্তের বেলায়। শস্যের খেত শীত শীত বাতাস আয় আয় করে। বর্ষা যাই যাই করে চলে যায় সোনালী ধান ক্ষেতের পাতায়। "১০

প্রকৃতি যে কত সুন্দর হতে পারে, প্রকৃতির মধ্যে যে কত সুঘ্রাণের ভাণ্ডার থাকতে পারে, জীবন সরকারের ছোটগল্পে বারবার তার অন্বেষণ ধরা পড়েছে--

" কাকডাকা ভোরে শিউলি গাছতলায় কুয়াশা ছাড়ায় মটরশুঁটির আঁকসায়।একদিন শীত নামে বিড়ালের গায়। জলের মাছেরা চুপ হয়ে যায়। চারদিকে শীতবুড়ি জাঁকিয়ে বসে আছে। আগুন পোহানোর একটা মেলা বসে সন্ধ্যামালতীর উঠোনে। পিঠা-পার্বণে নানা উৎসবে গ্রামের বাড়ি মেতে উঠে। মেয়েরা কাঁথা সেলাই করে। কখনও কখনও মায়ে ঝিয়ে একসঙ্গে গ্রাম্যবিয়ের গীত গায়। কেননা সামনেই মধুমাস। দখিনা বাতাস বুঝিয়ে দেয়, এইমাস বসন্তকাল। কোকিল ডাকে কুহু.... কহু।ভোরের স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইঙ্গিত।"১১

জীবন সরকারের ছোটগল্পের পাতা ভিজে গেছে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষের কান্নায়। দেশভাগের ফলে মানুষগুলির দুর্দশার সাথে সাথে প্রকৃতির মধ্যেও যে বেদনার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে জীবন সরকার তাকে রূপ দিয়েছেন অসামান্য ভাষায়। "শহীদ বলরামপুর" গল্পে বর্ণিত সেই প্রকৃতির রূপ -

"ফসলের ক্ষেতে চাষ নাই। নদীতে তেমনি মাছের ডিঙ্গি নেই। হাঁসেরা জলে নামছে না। গরু যাচ্ছে না মাঠে।কুকুরগুলি চুপচাপ দাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে। পাখিরা ডাকছে না গাছে। গাঁদা,মালতী টগরফুলের গাছে ফুল নেই। গ্রামগুলি আফিম খেয়ে ধুঁকছে। " ১২

দেশভাগের যন্ত্রনায় বহু আত্মীয় স্বজন এদিক ওদিক ছুটে গিয়েছে। কোন খোঁজ খবর নেই। বহু বছর পর হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় একজনের বাড়িতে গিয়ে ফেরার পথে যে অবস্থা হয়, তাকে গল্পকার এঁকেছেন প্রকৃতি দিয়ে--

"রাস্তায় নেমে একবার প্রকৃতির দিকে তাকালাম। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় লাল থোকা থোকা ফুল নীল আকাশের নীচে জ্বলজ্বল করছে। মনে হয় আমায় বলছে, আসবেন, আবার আসবেন। কখন যে আমার চোখে জল এলো বুঝতেই পারলাম না। অস্পষ্ট স্বরে বললাম -- আসবো, আবার আসবো। " ১৩

ছেড়ে আসা দেশের প্রকৃতির জন্য লেখকের মন প্রতিনিয়ত কেঁদে উঠে। লেখকের আক্ষেপ, সেই গাছ গাছালি, পাখ-পাখালি আর নেই। সব কিছুই পালটে গেছে। যেমন মানুষজন পালটে পালটে যায়। লেখকের ভাষায়-

"ধলেশ্বরী নদীর জন্য আমার মনটা কাঁদে। এখন আর ঐ নদীতে আগের মতো জল নেই। শুকিয়ে চর পড়ে গেছে। নদী অনেক ছোট হয়ে গেছে আগের থেকে। " ১৪

লেখক স্বপ্ন দেখেন, আবার যদি মাতৃভূমিতে যেতে পারেন তাহলে নীল আকাশের নীচে ধান ক্ষেতের দোলায় হাঁটবেন। কলমী লতায় ফড়িং, শাপলা পাতায় দক্ষিন বাতাস নিয়ে মেতে উঠবেন। মাতৃভূমির কথা উঠলেই জীবন সরকার যেন কবি হয়ে যান। নস্টালজিয়ায় ভরে যায় তাঁর স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ।

লেখকের অন্তঃকরণে ছিল বাংলাদেশের প্রকৃতির অপার রূপ। দেশভাগের সঙ্গে কান্নার কথা লিখতে গিয়েও লেখক তাকে ভুলতে পারেন না। "অন্য ঠিকানা" গল্পে তাই দেখা যায়, ওপার বাংলার প্রকৃতিকে লেখক বারবার রোমন্থন করেছেন। ভোরবেলায় উঠে আকাশের দিকে তাকানোটা ছিল গল্পকথকের সে সময়ের অভ্যাস।চিল উড়লেই বোঝা যেতো ওখানে প্রচুর মাছ ভাসছে। অসাধারণ প্রকৃতির সে রূপ। পূর্ববাংলার স্মৃতিতে লেখক এতোই ভারাক্রান্ত যে, তাকেও রূপ দিয়েছেন প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। তিনি স্বপ্ন দেখেন আবার কোনো একদিন নিজের জন্মভূমি মাতৃভূমিতে পা রাখবেন। শীতলাতলা বটগাছের নীচে একগাছি খড় দিয়ে ঘর বেঁধে জীবন কাটাবেন। ভোরবেলা মাঠে গেলে চাল, ডাল, সব্জী ইত্যাদি চাষিদের বাড়ি থেকে নিয়ে ফুটিয়ে আনন্দে খাবেন। আর আকাশের নীচে চাঁদের আলোয় গান গাইবেন---

"চাতক পাখির এমনি ধারা

তৃষ্ণাতে প্রাণ যায়গো সারা

অন্য বারি পায়না তারা

মেঘের জল বলে

দেখে কত দেয়গো

তবু চাতক মেঘের ভুলি

অমনি মত হলে আঁখি

শোধন মেলে।"১৫

উত্তর বঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনায় নদীর প্রসঙ্গ এলেই অনিবার্যভাবে এসে যায় তিস্তা নদীর নাম।তিস্তাকে নিয়ে আছে অনেক অনেক রূপকথা। জীবন সরকার তাঁর

" চোরাকোটাল" গল্পে তিস্তাকে এঁকেছেন এইভাবে--

"তিস্তা নদী যেমন দু'পার ভেঙে চলেছে সেইরকম আরকি। এপার ভাঙে তো ওপার গড়ে। এইতো নদীর খেলা। ঝড়,জল,বন্যা -এই নিয়েই তো তিস্তাপারের লোকজন বেঁচে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ চলছেই। কখনো মানুষ হেরে, কখনো মানুষ জেতে। এর ব্যতিক্রম আর কিছু নেই, বসত - আবাদ সবই তিস্তার গা ঘেঁষে। নদীর সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়া আছে। কিন্তু তিস্তা কখন খেপবে, কেউই বলতে পারে না। এই যে বন্যায় প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেলো তা তো অনুমানের মধ্যে ছিল না, হঠাৎ করেই হল। কেউ কি আগে জানতো জলে চোরাকোটাল বইছে। তিস্তার জলে চাষ-আবাদের বাহার উঠে। সরষে, মটরশুঁটি সবুজ বিছানা নিয়ে শুয়ে আছে। সরষে ক্ষেত হলুদে হলুদ। " ১৬

উত্তরবঙ্গে নদী- নালার সংখ্যা এমনিতেই বেশি। তাই বর্ষার দিনে এখানে বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়। আর আছে হড়কা বাণ। এই হড়কাবানের জন্য দায়ী তিস্তার পূর্ব দিকের ভুটান নদীখাত।ভুটানের নদীগুলি থেকে জল এসে ভাসিয়ে দেয় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাকে। গল্পকারের কলম তাকেও তুলে ধরেছে। উত্তরবঙ্গকে জানতে হলে জীবন সরকারের গল্প অন্যতম দলিল হতে পারে।

প্রকৃতির যেমন সুন্দর রূপ আছে, তেমনি তার ভয়াল- ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপও আছে। বন্যা- ঘুর্ণিঝড় - ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিতে মানুষ হয়ে যায় প্রকৃতির কাছে পুতুল নাচ খেলার পুতুলের মতো । এমনই গল্প "চালি"। ঘুর্ণিঝড়ের ফলে প্রকৃতির রুষ্ট রূপের বর্ণনা আছে এই গল্পে। বর্ষার দিনে ব্রহ্মপুত্রের জল কালো, আকাশে মেঘের সঙ্গে জলও যেন কাঁপছে। জলের এক একটা ঢেউ যেন বড় বড় তাল গাছের মতো। একবার উঠছে, আরেকবার পড়ছে। এরমধ্যেই চালি নিয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ। চালি মানে বাঁশের বোঝা বেঁধে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। হঠাৎ এসে যায় ঘুর্ণিঝড়। লেখকের বর্ণনায় প্রকৃতির সে রূপ--

" এ ঘুর্ণিঝড়। সর্বনাশ , এখন কী হবে। বাতাসের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেলো বৃষ্টি । জলের মধ্যে যেন তুবড়ি ফুটছে। কী শব্দ তার। বৃষ্টির জলে চারপাশে আবছা ধোঁয়া। কাগজের নৌকার মতো এতবড় চালিটা দুলছে। এক্ষুণি বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশ ফেটে বৃষ্টি। মনে হয়, পৃথিবী শেষ হয়ে

যাবে। "১৭

প্রকৃতির শান্ত-শ্যামল রূপ জীবন সরকার যেমন অঙ্কন করেছেন, তেমনি প্রকৃতির ভয়াল রূপকেও তিনি এঁকেছেন। আসলে প্রকৃতি যে তাঁকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকতো,একথা তাঁর আত্মকথায় অসংখ্যবার বলেছেন জীবন সরকার--

" বাংলার মানুষ, নদ- নদী, নিসর্গই আমাকে গল্পকার করেছে। আমার গল্পে ভাষা যোগান দিয়েছে। "১৮

প্রকৃতির অমোঘ টানেই বারবার তিনি পথে বেরিয়েছেন।প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের রূপবিভায় বারবার পথিক কবির মতোন রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, তৃপ্ত করেছেন মনের আকুণ্ঠ রূপ-তৃষ্ণার পিপাসাকে। বলতে গেলে প্রকৃতিই ছিল তাঁর অন্তর্লোকের আসল ঘরবাড়ি। প্রকৃতির কাছে এলেই তিনি বোধ করতেন তৃপ্তি। আর এই তৃপ্তির সুস্বাদু অভিজ্ঞতামালা ছড়িয়ে দিয়েছেন ছোটগল্পের পাতায়। " কাছিম" গল্পের পিঙ্গলি, "হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া" গল্পের টগরির মতো চরিত্র অঙ্কন করে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন বিপুলতা ও রহস্যের সন্ধান। তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক ছোটগল্পগুলিতে দৃষ্টির অন্তর্লীণ মগ্নতা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্যনীয় । এইজন্যই তিনি কথাশিল্পী হয়েও, হয়ে উঠেছেন কখনও কখনও কবি ও চিত্রকর। প্রকৃতির মগ্ন প্রেমিক হবার জন্যই তাঁর গল্পগুলির ভিতরে প্রকৃতি চেতনার যে রসধারা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তা রঙে বর্ণে আমাদের কাছে এক মোহমুগ্ধতার আবেশ ফুটিয়ে তোলে। আর সেই প্রকৃতি চেতনার নদীতে স্নান করে পাঠকরা শুধু আপ্লুতই হয় না, মর্মের গভীর দেশে এক আনন্দঘন রহস্যানুভূতির তুরীয় আনন্দ অনুভব করে। জীবন সরকারের প্রকৃতি চেতনার বিশেষত্ব এখানেই। প্রকৃতিকে তিনি নিবিড় অন্তর গহনের আলোকে রঞ্জিত ও বর্ণিত করে তুলেছেন।

তথ্য নির্দেশ

---

১) সরকার জীবন : "আমি ও আমার লেখা", "চিকরাশি", 'জীবন সরকার সংখ্যা', সম্পাদক- অমিত কুমার দে, পৃষ্ঠা-৩৫

২) সরকার জীবন : " হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া", 'চিকরাশি', জীবন সরকার সংখ্যা, সম্পাদক- অমিত কুমার দে, পৃষ্ঠা- ৩৮

৩) তদেব : পৃষ্ঠা-৩৯

৪) তদেব : পৃষ্ঠা-৩৯

৫) তদেব : পৃষ্ঠা-৪০

৬) সরকার জীবন : "ভিন গাঁয়ের রাজপুত্তুর", 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-১৫

৭) তদেব : পৃষ্ঠা- ১৬

৮) তদেব : পৃষ্ঠা-১৬

৯) তদেব - পৃষ্ঠা-১৭

১০) সরকার জীবন : " দিন যায় ", 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৭

১১) তদেব : পৃষ্ঠা-২৮

১২) সরকার জীবন : "শহীদ বলরামপুর", 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৬

১৩) তদেব : পৃষ্ঠা-২৭

১৪) তদেব : পৃষ্ঠা-২৮

১৫) সরকার জীবন : "অন্য ঠিকানা ", 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৮১

১৬) সরকার জীবন : "চোরাকোটাল ", 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-৩৪

১৭) সরকার জীবন : "চালি" 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প", একুশ শতক, ১৫- শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-৯৩

১৮) সরকার জীবন : "আমি ও আমার লেখা", "চিকরাশি", 'জীবন সরকার সংখ্যা', সম্পাদক- অমিত কুমার দে, পৃষ্ঠা-৩৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

---

১) দাশ শিশিরকুমার : " বাংলা ছোটগল্প ", দে'জ পাবলিশার্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর-১৯৬৩,পঞ্চম সংস্করণ-২০০৭

২) মজুমদার পরেশচন্দ্র : " বাংলা ভাষা পরিক্রমা ", দে'জ পাবলিশার্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ - জানুয়ারী-১৯৯২

৩) ভট্টাচার্য সুভাষ : " ভাষা কোষ ", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ -বইমেলা -২০১৪

৪) চক্রবর্তী উদয় কুমার : "ভাষা বিজ্ঞান ", দে'জ পাবলিশার্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা -৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি -২০১৬

৫) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ : "সাহিত্যে ছোটগল্প", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ - শ্রাবণ- ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

৬) ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা) : "দেশভাগ- স্মৃতি আর স্তব্ধতা ", গাঙচিল, মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক , ঘোলাবাজার, কোলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ - ১ মার্চ- ২০০৮

৭) বর্মন প্রসূন (সংকলক ও সম্পাদনা) : " দেশভাগ - দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত ", ভিকি পাবলিশার্স, সরস্বতী এপার্টমেন্ট, ভাঙাগড়, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ -১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৮) বসু বুদ্ধদেব : " বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ -এপ্রিল -১৯৯৭, প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ - বইমেলা- ২০১০।

৯) শ ড.রামেশ্বর : "সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ", পুস্তক বিপনি, ব ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন -১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

১০) সেন সুকুমার : “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”(তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৬,বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা -৭০০০০৯,প্রথম প্রকাশ-১৩৫০ বঙ্গাব্দ। চতুর্দশ সংস্করণ -আষাঢ় -১৪১০ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক পত্র- পত্রিকা

---

১) আচার্য্য অনিল (সম্পাদক) :" অনুষ্টুপ" পত্রিকা, শারদীয়-১৪১৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যা, কার্যালয়- ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯।

২) দে অমিতকুমার (সম্পাদক) : "চিকরাশি", 'জীবন সরকার সংখ্যা', কার্যালয়- ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।

৩) সেনগুপ্ত সুমন (সম্পাদক) : " বইয়ের দেশ", অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা, এবিপি পা: লি: এর পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, ড. প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০১